প্রথম আলো

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সন্ত্রাস ■ মশিউল আলম

ছাত্রলীগের 'আত্মরক্ষা' ও নিষ্ক্রিয় আইন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সহিংসতায় 'যতজনের হাতে অস্ত্র দেখা গেছে, তারা সবাই ছাত্রলীগের নয়'—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে এই কথা বলেছেন। এর মানে দৃশ্যমান অস্ত্রধারীদের কয়েকজন ছাত্রলীগের। তাহলে ছাত্রলীগের এই অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ছাত্রলীগের যারা, আমরা তাদের বহিষ্কার করেছি। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' বহিষ্কার মানে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার। এটা রাষ্ট্রের কোনো আইনি পদক্ষেপ নয়, সাংগঠনিক ব্যবস্থামাত্র। তাঁরা যে ফৌজদারি অপরাধ করেছেন, সে বিবেচনায় এটি নিতান্তই এক লঘু পদক্ষেপ, যা লোক দেখানো বলে কেউ ধরে নিলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া আমরা জেনেছি, বহিষ্কৃত হয়েছেন সেদিনের অস্ত্রধারীদের মধ্য থেকে মাত্র দুজন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে অন্তত ছয়জন অস্ত্রধারীর ছবি ছাপা হয়েছে, যাঁরা ছাত্রলীগের নেতা। বাকি চারজনকে কেন বহিষ্কার করা হয়নি? তাঁদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে?

ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে 'আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে'—প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি তথ্য না আশ্বাস, তা আমরা জানি না। কিন্তু কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার খবর এখনো পাওয়া-যায়নি। বরং যাঁদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কেউই ছাত্রলীগের নন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেগুলোর কোনোটিতেই ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী কোনো নেতাকে আসামি করা হয়নি। আসামি করা হয়েছে ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের, যাঁরা প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ব্যানারে বর্ধিত ফি ও সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স বন্ধ করার দাবিতে আন্দোলন করছেন।

আর ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের আসামি করা হয়েছে—এটা কোনো খবর নয়। কারণ, এটা যে করা হবে, তা আগে থেকেই সবার জানা। মামলা দায়েরের আগেই সরকারের একাধিক নেতা সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, গোলাগুলি করেছেন আন্দোলনকারীদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা শিবিরের কর্মীরা। কিন্তু রহস্যজনক ব্যাপার হলো শিবিরের কোনো অস্ত্রধারীর ছবি কেউ তুলতে পারেনি। এমনকি আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কোনো অস্ত্রধারী শিবিরের কর্মীকে দেখেছেন, এ রকম খবরও পাওয়া যায়নি। শিবিরের কর্মীরা সম্ভবত নিজেদের অদৃশ্য রেখে অস্ত্রচালনার কায়দা রপ্ত করেছেন কিংবা তাঁরা এমন মন্ত্র জানেন, যা পড়ে ফুঁ দিয়ে তাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ফোটাবেন কিন্তু কেউ তাঁদের দেখতে পাবে না। শুধু অ্যাকশনের সময় অদৃশ্য থাকা কেন? অ্যাকশন শেষ করার পরও তাঁরা বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়ার কায়দা জানেন। নইলে পুলিশ তাঁদের একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারল না কেন? শিবির কি ছাত্রলীগ যে আইনের হাত তাঁদের স্পর্শ করার হিম্মত রাখে না?

না, ছাত্রলীগের কেউ অপরাধ করলে আইন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এমন সাধারণীকরণ সঠিক নয়। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের বিচারে ছাত্রলীগের ২২ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তিনি বলেছেন। আদালতের রায়ে ১৪ জনের ফাঁসির রায়ের সংবাদ ইতিমধ্যে সুবিদিত এবং প্রশংসিত। কিন্তু স্মরণ না করে পারা যায় না যে বিশ্বজিতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, হত্যাকারীদের কেউই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী নন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরও বলেছিলেন একই ধরনের কথা। কিন্তু হত্যাদৃশ্যের ভিডিও ফুটেজ সম্প্রচারমাধ্যমে বারবার প্রচার, পুরো সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা এবং দেশব্যাপী ধিক্কার উঠেছিল। জনমতের প্রবল চাপের ফলে ঘটনার দুদিন পর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে তাঁরা বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার আসামি। কিন্তু ওই দিনই ঢাকা মহানগরের পুলিশ কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্বজিৎ হত্যার ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি, যাঁদের গ্রেপ্তারের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা কেউ বিশ্বজিৎ হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। এ রকম কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছিল একটিই বিষয়: সরকার বিশ্বজিৎ হত্যাকারী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আইনের আওতায় নিতে চায় না, পার পাইয়ে দিতে চায়। ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে সংবাদমাধ্যম দিনের পর দিন লেগে

শত শত শিক্ষার্থীকে আসামি করে তাঁদের মাথার ওপর একাধিক ফৌজদারি মামলা ঝুলিয়ে রাখলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা কাটবে না, পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরবে না

না থাকলে যে বিচার শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তা পাওয়া যেত কি না সন্দেহ।

কিন্তু সে জন্য বিশ্বজিৎ হত্যার বিচার করার জন্য সরকারের যে ধন্যবাদ ও প্রশংসা প্রাপ্য তা অস্বীকার করা যায় না। ধন্যবাদ আমরা দিয়েছি, প্রশংসা করতেও কার্পণ্য করিনি। এবং আমরা চাই আইন প্রয়োগের এই দৃষ্টান্ত বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে না থেকে যেন সরকারের সাধারণ প্রবণতা হয়ে ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ছাত্রলীগের ছেলেরা সেখানে যেতে পারে না, তাদের রগ কেটে দেওয়া হয়—প্রধানমন্ত্রীর এসব অভিযোগের প্রতিকার করার দায়িত্ব সরকারের, আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের, ছাত্রলীগের নয়।

প্রধানমন্ত্রী সংসদে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমাদের ছেলেদের কি জীবন বাঁচাবার অধিকার নেই?' সরকারপ্রধানের কণ্ঠে এমন কথা উচ্চারিত হলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও ব্যবহারে আরও উৎসাহিত হবেন। এমন কথা তিনি এর আগেও বলেছেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী এবার এ কথাও বলেছেন, 'তবু সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীই, সন্ত্রাসীদের বরদাশত করা হবে না।' কিন্তু তার পরেই আবার 'আত্মরক্ষার অধিকার সবার আছে'—এ কথাও বলেছেন। ফলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে যেতে পারে যে 'আত্মরক্ষার্থে' আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও ব্যবহার করার পক্ষে খোদ প্রধানমন্ত্রীর সায় আছে।

কিন্তু ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও ব্যবহার করলে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য থাকে না। ইসলামী ছাত্রশিবির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায় বলে সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি ক্রমেই প্রবলতর হয়েছে। তারা তাদের রগকাটা কুখ্যাতি অতিক্রম করে পেশাদার দুর্বৃত্তদের মতো চোরাগোপ্তা হামলাকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষত গত এক বছরে জামায়াত-শিবিরের ব্যাপক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাদের ব্যাপারে আপত্তি শুধু দেশের ভেতরে সীমাবদ্ধ নেই, আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোও তাদের প্রতি প্রচণ্ড নাখোশ। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অভিযোগ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে নয়, বরং তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা নিয়ে।

সন্ত্রাসের কারণে ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুললে একই কারণে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিও যুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু কার যুক্তি কে মানবে, কে মানে এই দেশে? সন্ত্রাসী আচরণের কারণে ছাত্রলীগকে ছাত্রশিবিরের সঙ্গে তুলনা করলে তার প্রতিবাদে এই যুক্তি উত্থাপন করা হতে পারে যে ছাত্রলীগ আক্রমণ করে না, আত্মরক্ষার তাগিদে প্রতিক্রিয়া করে মাত্র। আত্মরক্ষার অধিকার তো ছাত্রলীগেরও আছে। কিন্তু ছাত্রলীগের অভিভাবক দল আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বলে আত্মরক্ষা কিংবা যে প্রয়োজনেই হোক, ছাত্রলীগ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারসহ সহিংসতায় লিপ্ত হলে সরকারের এমন বেকায়দা হয় যে মন্ত্রীরা দিশাহারা হয়ে অসত্য-অর্ধসত্য কথা বলেন। সংবাদমাধ্যম সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এভাবে ছাত্রলীগ গত পাঁচ বছরে অজস্রবার সরকারকে ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। কিন্তু সরকার এটা সহ্য করে কেন?

'সন্ত্রাসী সন্ত্রাসীই, সন্ত্রাসীদের বরদাশত করা হবে না'—প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি আন্তরিক হলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সেদিন যে ছয় অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের নেতাকে দেখা গেছে, যাঁদের সশস্ত্র ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। তাঁদের আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে এক গন্ডা মামলা দায়ের করে শত শত শিক্ষার্থীর গায়ে ফৌজদারি আসামির ছাপ্পড় মেরে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আর ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরাই যদি সব সন্ত্রাসের হোতা হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের একজনকেও পুলিশ এখন পর্যন্ত অস্ত্র-বিস্ফোরকসহ পাকড়াও করতে পারল না কেন, এই প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া দরকার।

শান্তিপূর্ণভাবে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের মামলার আসামি করা ঠিক হয়নি, বাম ধারার ছাত্রসংগঠন করা আইনের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ নয়, আসামির তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া উচিত। শত শত শিক্ষার্থীকে আসামি করে তাঁদের মাথার ওপর একাধিক ফৌজদারি মামলা ঝুলিয়ে রাখলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা কাটবে না, পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরবে না। কিন্তু এখনকার প্রধান বিবেচনা হওয়া উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনে ফিরতে হবে।

● মশিউল আলম : সাংবাদিক, কথাসাহিত্যিক।